ইতিহাসে হাতেখড়ি

যুদ্ধের নানা দিক

লেখা

শান্তনু সেনগুপ্ত

ছবি

রঞ্জিত চিত্রকর

সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর

IDSK

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

ইতিহাসে হাতেখড়ি: যুদ্ধের নানা দিক

লেখা
শান্তনু সেনগুপ্ত

কলকাতা, অক্টোবর ২০২৩

ইতিহাসে হাতেখড়ি: যুদ্ধের নানা দিক
কলকাতা, অক্টোবর ২০২৩

লেখা – শান্তনু সেনগুপ্ত
সম্পাদনা – অন্বেষা সেনগুপ্ত, দেবারতি বাগচী
ছবি– রঞ্জিত চিত্রকর, সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর
প্রচ্ছদ, মানচিত্র ও পরিকল্পনা – ওয়াসিম হেলাল
মুদ্রণ – এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
প্রকাশক - ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা
ডিডি ২৭/ডি, সেক্টর ১, কলকাতা- ৭০০০৬৪
ওয়েবসাইট - www.idsk.in
ইমেইল - idsk@idskmail.com / office@idsk.edu.in

আর্থিক সহায়তা – রোসা লুক্সেমবুর্গ স্টিফটুং, লিয়াসঁ অফিস, নয়া দিল্লী
সি -১৫, এস ডি এ মার্কেট, নয়া দিল্লী -১১০০১৬
ওয়েবসাইট – https://www.rosalux.in
ইমেইল - south-asia@rosalux.org
এই বইটি শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি/ অসরকারি প্রতিষ্ঠান, নীতি নির্ধারক সংস্থা, সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

This publication is sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with grants from the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication.

The content of the publication is the sole responsibility of the partner and does not necessarily reflect a position of RLS.

সূচিপত্র

১।	যুদ্ধের রকমফের	৮
২।	প্রকৃতি, পরিবেশ ও যুদ্ধ	১৩
৩।	দেশে-বিদেশে যুদ্ধ	২৩
৪।	মুক্তিযুদ্ধ	৩৫
৫।	যুদ্ধের রিপোর্ট কার্ড	৪৩
	খটমট শব্দ	৫১
	শেষের কথা	৫৬

ম্যাপ স্কেল অনুসারে নয়

যুদ্ধের খবর

অন্নদাশংকর রায়

এসব আমার চক্ষে দেখা
নয়কো এসব শোনাশুনি
অশ্ব চলে আড়াই কদম
গজ চলেছে কোনাকুনি।
নৌকা চলে সরল রেখায়
সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে

মানুষ চলে গুটি গুটি
হাঁটছে যেন একটি পায়ে।
কি ভয়ানক লড়াই সে যে
এসব আমার বড়াই নয়।
একেক চালে একেক জনের
জানটা বুঝি কাবার হয়।

১) যুদ্ধের রকমফের

মোবাইল খুললেই নানা ধুম ধাড়াক্কা যুদ্ধের খেলা দেখা যায়। ভয়ানক সব অস্ত্র হাতে সৈনিকরা একে তাকে মেরে জিতে যাচ্ছে সেই খেলায়। টিভি খুললেও তো আমরা হাঁ করে দেখি রকেট, মিসাইল আর মেশিনগান নিয়ে সাংঘাতিক সব কাণ্ড ঘটছে নানা সিনেমায়। এক দল দুষ্টু, হেরে যাচ্ছে, আর যারা ভালো তারা যাচ্ছে জিতে। কিন্তু আমরা তো এও দেখি কত লোক মারা যায় যুদ্ধের সিনেমাগুলোতে। কত মানুষের কষ্ট হয় যুদ্ধ হলে। সত্যি সত্যি শুধু দুটো বিশ্বযুদ্ধেই মানুষ মরেছে প্রায় দশ কোটির ওপর। তাও তো যুদ্ধ থামে না! এই তো এখনই যেমন রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে। তা প্রায় দেড় বছরের বেশি হল, থামার নাম নেই। কত মানুষ ঘরছাড়া, হারিয়ে গেছে কতজন, কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি, গির্জা, মূর্তি সব ভেঙে যাচ্ছে বোমার আঘাতে। চাষের মাঠে ফসল ফলছে না। তাও আমরা যুদ্ধ করি কেন?

সভ্যতার শুরু থেকে মানুষে মানুষে যুদ্ধ হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রাচীন মহাকাব্যগুলো তো যুদ্ধকে ঘিরেই লেখা। মানুষের চাওয়ার কোনও শেষ নেই, সে যত পায় তত বেশি চায়। আর না পেলেই 'জোর যার মুলুক তার' বলে যুদ্ধ করে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কখনও জমি, কখনও জল, কখনও বা তেল দখল করবার জন্য তারা যুদ্ধ করে। কখনও কখনও ধর্ম বা

ভাষার দোহাই দিয়েও তারা লড়াই করতে নামে। কখনও কখনও আবার নিজেকে অন্যের অন্যায় শাসন থেকে রক্ষা করতে, নিজের অধিকার রক্ষা করতেও যুদ্ধে নামতে হয়েছে মানুষকে। পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডের মত ইউরোপের দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে উপনিবেশ হিসেবে দখল করে রেখেছিল। ইউরোপীয়দের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য সেই সব দেশের মানুষের লড়াই কোথাও কোথাও যুদ্ধের আকার নিয়েছিল। যেমন উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়াতে ফ্রান্সের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত যুদ্ধ হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোট্ট দেশ ভিয়েতনামেও দু-দুটি দফায় মুক্তিযুদ্ধ হয়। আর আমাদের একেবারে কাছেই বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পরে। খানিক পরে সেকথায় আসছি।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, নীতিবোধ, রাজনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি অনেক পাল্টেছে। তেমনই পাল্টেছে যুদ্ধের ধরনও। যুদ্ধ করার প্রযুক্তি যত উন্নত হয়েছে, ততই বেড়েছে যুদ্ধের এলাকা আর ধ্বংসের হিসেব। আদিম যুগের পাথরের অস্ত্রের জায়গায় এসেছে মিসাইল। হাতি-ঘোড়া, তলোয়ারের জায়গায় এসেছে ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান, নতুন নতুন বন্দুক আর কামান। কোনও কোনও দেশের ভাণ্ডারে রয়েছে পারমাণবিক বোমাও। আগেকার যুদ্ধেও

ক্ষয়ক্ষতি হত ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধের ধরন এমন ছিল যে অল্প জায়গায় সীমিত থাকত। আর সাধারণ মানুষের জীবনে যুদ্ধের আঁচ পড়ত এখনকার থেকে কম। কিন্তু দুটো বিশ্বযুদ্ধে সব আমূল বদলে গেল। পৃথিবী জুড়ে সমাজ, অর্থনীতি, মানুষের রোজের জীবনের উপর যুদ্ধের প্রভাব পড়া শুরু করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শহর গ্রাম সব মুহূর্তের মধ্যে বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা ফেলেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুই জায়গা মিলিয়ে প্রায় দু-লক্ষ মানুষ মারা পড়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে যুদ্ধের ধরন পাল্টেছে একথা মাথায় রেখে আমরা পড়ব যুদ্ধের ইতিহাস।

যুদ্ধের ইতিহাস নানাভাবে পড়া যায়। কোনও একটা যুদ্ধের কারণ আর ফলাফল হতে পারে সেই ইতিহাসের বিষয়। যুদ্ধে নতুন নতুন জায়গা দখল বা হাতছাড়া হওয়ায় কোনও অঞ্চলের মানচিত্র কীভাবে পাল্টে পাল্টে গেছে তাও হতে পারে যুদ্ধের ইতিহাস পড়ার একটা উপায়। পরপর সাল ধরে এগিয়ে কে কোন জায়গায় যুদ্ধ করল, সাম্রাজ্য কীভাবে এগোল, কোন সম্পদ কার দখলে এল—এরকম ভাবেও যুদ্ধের ইতিহাস লেখা যায়। কিন্তু তা না করে, এই বইতে কতগুলো অন্য প্রশ্নকে সামনে রেখে যুদ্ধের ইতিহাস পড়ব আমরা। প্রকৃতি কীভাবে

যুদ্ধকে প্রভাবিত করে? এক জায়গার যুদ্ধ কীভাবে বদলে দিতে পারে দূরের কোনও জায়গার জীবনযাপন? মানুষের অধিকারের জন্য যুদ্ধ করার ব্যাপারটা কী? পৃথিবীর ইতিহাস জুড়ে কত যুদ্ধই না হয়েছে! আমরা এই বইতে আলোচনার সুবিধার জন্য বেছে নিয়েছি পূর্ব ভারত-বাংলাদেশের দিকটা। এই অঞ্চলের নানা সময়ের যুদ্ধের ইতিহাস থেকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর।

২) প্রকৃতি, পরিবেশ ও যুদ্ধ

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে এক এক জায়গার প্রকৃতি, আবহাওয়া বা পরিবেশ অনুযায়ী সেখানে যুদ্ধ করার পদ্ধতি আলাদা হয়। তবে কোন সময়ের যুদ্ধ, তখন অস্ত্রের ব্যবহার কেমন ছিল এই কথাগুলোও মাথায় রাখতে হবে। দুই পক্ষ সেপাই-সান্ত্রী, হাতি-ঘোড়া, তলোয়ার-কামান-রাইফেল নিয়ে যখন কোথাও যুদ্ধ করে, তখন তো সেখানকার জমি-মাটি, নদীনালা, ঝড়বৃষ্টি এসব দেখেশুনে নিতে হবেই! মুঘলদের কথাই যদি ধরি, তারা রাজস্থানেও যুদ্ধ করেছিল, বাংলা-অসমেও করেছিল। ১৫৭৫ সালে আকবরের আমলে বাংলা জয়ের চেষ্টা শুরু হয়েছিল। রাজস্থানের শুকনো মাটিতে ঘোড়া আর কামান নিয়ে যুদ্ধ করতে কোনও অসুবিধে হয়নি তাদের। কিন্তু বাংলা-অসমে এসে জঙ্গল, নদী-নালা, খাল-বিল, প্রচণ্ড বৃষ্টি আর বন্যায় ভারি বিপাকে পড়ল তারা। ঘোড়া আর ভারী ভারী কামান সব জল-কাদায় আটকে যেত। তাই যুদ্ধের নতুন নতুন কায়দা শিখতে হল তাদের। জলা জায়গায় যুদ্ধ করার জন্য তাই মুঘলরা নানা রকম নৌকো ব্যবহার করা শিখল। ঘুরাব বলে একরকম বড় নৌকোর ওপর কামান বসানোর ব্যবস্থা করা হল। ডাঙা আর জল দিয়ে একসাথে আক্রমণ

করবার কায়দাও রপ্ত করেছিল তারা। জলা জমিতে বা নদীর উপর হাতিকে নানা ভাবে ব্যবহার করাও শুরু করল।

যুদ্ধ তো শুধুই রাজা-বাদশাহদের ব্যাপার না। দাবার বোর্ডটা একবার ভাবি, কতরকম চরিত্র সেখানে। আর দাবা তো আসলে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। দুপক্ষের রাজা বা রানির দুই পাশে মন্ত্রী, হাতি, ঘোড়া, নৌকো। সামনে দাঁড়িয়ে থাকে বোড়ে বা সাধারণ সৈনিকরা। এই যুদ্ধ যদি বাংলা-অসমের মতো জলা জায়গায় হয়, তবে কিন্তু নৌকো হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর মাঝিমাল্লারা এইখানে দাবার বোর্ডের বোড়েদের বড় অংশ। মুঘলদের বাংলা অভিযানের সময় ভীষণ জরুরি হয়ে উঠেছিলেন এখানকার মাঝিমাল্লারা। নৌকো বানানো বা বাওয়ার জন্য এরা না থাকলে মুঘলরা মোটেও সুবিধে করতে পারত না। স্থানীয় কায়দায় স্রেফ কাদামাটি ব্যবহার করে নদীর পারে গড় বা দুর্গ তৈরি করে যুদ্ধ করার কায়দাও তো এঁদেরই শেখানো। দাবিদাওয়া না মেটালে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন এই মাঝি-মাল্লারা। একটা গল্প বলি। ১৬০৮ সালে মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিস্তি চলেছেন মুসা খান বলে এক আফঘান নেতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এক গাদা নৌকো নিয়ে যাওয়ার পথে সে এক বিষম গন্ডগোল।

একদিন সকালে উঠে ইসলাম খান দেখলেন মাইনে না পেয়ে ক্ষেপে গিয়ে মাঝিমাল্লারা সব পালিয়েছেন। ব্যস, তিনি তাঁর দলবল নিয়ে গেলেন আটকে। মহা বিপদ! মাঝিমাল্লারা না ফিরলে যুদ্ধ করবেন কেমন করে! বোঝাই যাচ্ছে, কেমন ক্ষমতা ছিল তাঁদের।

নদী-জলের সঙ্গে লড়াই করে মুঘলরা শেষমেশ বাংলায় তাদের শাসন কায়েম করেছিল ১৬৬৬ সাল নাগাদ, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে। ততদিনে বাংলায় নৌকো নিয়ে যুদ্ধ করার কায়দা কিছুটা রপ্ত করতে পেরেছিল তারা। কিন্তু আরও পূর্বে কামরূপের (এখনকার অসম) দিকে যখন মুঘলরা এগোল, সেখানে ব্রহ্মপুত্র একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল তাদের। অসমে ছিল ঘন জঙ্গল, পাহাড় আর বর্ষাকালের ভয়ানক ব্রহ্মপুত্র নদী। নদীর যুদ্ধে মুঘলদের তুলনায় অসমের মানুষজন ছিলেন সহজাতভাবে এগিয়ে। মুঘলরা বড় বড় কামান বসানো নৌকো তৈরি করেছিল। কিন্তু নিজেদের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী, নদীর চরিত্র বুঝে নৌকো বানাতে আর বাইতে ঢের বেশি ওস্তাদ ছিলেন অসমের মানুষ। ছোট কিন্তু দ্রুত গতির নৌকো নিয়ে রাতের অন্ধকারে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করে মুঘলদের একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন তাঁরা। শেষপর্যন্ত ১৬৭১ সালে সরাইঘাটের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর অসম ছেড়ে

চলে আসতে শুরু করে মুঘলরা।

বছর সত্তর পরে, বাংলার বর্ষা কাবু করেছিল মারাঠা বর্গিদের। বাংলার সিংহাসনে তখন নবাব আলিবর্দি খান (১৭৪০-১৭৫৬) । আঠারো শতকের গোড়ার দিক থেকে বর্গি বলে পরিচিত মারাঠা সৈন্যরা দস্যুর মতো হানা দিয়েছিল বাংলার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে। তাদের দাবি ছিল চৌথ বলে এক রকম কর। সহজ কথায় বাংলার মানুষ নবাবকে যত খাজনা দিতেন তার ১/৪ অংশ আবার মারাঠাদেরও দিতে হবে, এমনটাই ছিল দাবি। মানুষ তো ভয়ে কাঁটা! এত খাজনা দিলে কীভাবে দিন চলবে তাঁদের, আর তাঁরা খাবেনই বা কী, সেই চিন্তা থেকেই বোধহয় কেউ এই ছড়াটা তখন বেঁধেছিলেন:

খোকা ঘুমোলো
পাড়া জুড়োলো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে!

চৌথ না পেয়ে মারাঠা বর্গিরা বাংলা জুড়ে লুঠপাট, খুন জখম শুরু করল। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিল তারা। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র কোনও মানুষই এই দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাননি। ক্রমাগত আক্রমণে নবাব আলিবর্দি খানের বাহিনী যখন একেবারে নাকানি চোবানি খাচ্ছে, তখন শেষে বাংলার বর্ষাই আটকেছিল বর্গিদের। তবে বৃষ্টি থামতেই আবার শুরু হয়েছিল তাদের অত্যাচার। শেষ পর্যন্ত ১৭৪৪ সালে আলিবর্দি খান নানা কৌশলে বর্গিদের ঠেকাতে পেরেছিলেন।

বাংলা-অসমে যে কোনও যুদ্ধেই নদী-জল, ঝড়বৃষ্টিকে সামাল দেওয়া একটা বড় কাজ ছিল। আঠারো শতকের মাঝমাঝি থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিপত্তি বাড়ছিল বাংলায়, আর ক্রমশ দুর্বল হচ্ছিল নবাবদের ক্ষমতা। কোম্পানির ইংরেজ সাহেবরাও বুঝেছিল নদ-নদীকে বাগে আনতে না পারলে এই অঞ্চলে বাণিজ্য করা বা শাসন করা দুইই খুব কঠিন। হুগলি নদীর বাণিজ্যের দখল নিয়ে, বাংলার দক্ষিণের নিচু জলা জমিতে কলকাতা শহর তৈরি করল তারা। এইখান থেকেই আস্তে আস্তে বাংলায় রাজত্ব পাকাপোক্ত করার পথে এগোল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তবে মুনাফা আর ক্ষমতার লোভ তাদের কেবল বাংলায় থামিয়ে রাখেনি।

মুঘলদের মতোই আরও পূর্বে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তারা। অসম, কাছাড়, মণিপুর, চট্টগ্রাম, আরাকান (এখনকার বর্মা) জুড়ে তখন বর্মি রাজাদের দারুণ দৌরাত্ম্য। ইরাবতী, ব্রহ্মপুত্র এইসব নদীর উপর ছিল তাদের একচেটিয়া দখল। এদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নদীতে বিনা বাধায় নৌকো চালাতে হবে তো ইংরেজ কোম্পানিকে! তাই বর্মিদের হারিয়ে নদীর দখল পাওয়া জরুরি ছিল। যুদ্ধ বাঁধল ইংরেজ আর বর্মিদের, ১৮২৪ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত চলল প্রথম ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ। মূলত জঙ্গল আর নদীপথেই যুদ্ধ হয়েছিল। আরাকান রাজাদের আসল শক্তি ছিল বিশাল বিশাল সব নৌকো। কিন্তু প্রযুক্তি যে অনেক হিসেব পাল্টে দেয়, তা বোঝা গেল যখন ডায়ানা বলে কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া একটি স্টিমার, ইরাবতি নদীর যুদ্ধে আরাকান রাজাদের নৌকোগুলোকে হারিয়ে দিল। এই প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে যুদ্ধের জন্য আধুনিক স্টিমার ব্যবহার হল। সেই বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের শক্তির সামনে বর্মিদের পুরনো ধাঁচের নৌকোগুলো বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। বর্মিদের হারিয়ে চট্টগ্রাম, কাছাড়-সহ আরাকানের একটা অংশের উপর ইংরেজদের অধিকার তৈরি হয়েছিল।

সাহেবরা যতদিন এদেশে শাসন করেছিল, নদীর উপর ছিল তাদের কড়া নজর। ব্রিটিশ

শাসনের এক্কেবারে শেষের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময়ে জাপান যখন বর্মা দখল করে, তখন ব্রিটিশ শাসকদের ভয় হয় যে তারা বাংলা, অসম, মণিপুরেও ঢুকে পড়বে। জলপথে জাপানি শত্রু ঢুকতে পারে সেই ভয়ে প্রচুর নৌকো নষ্ট করে দিয়েছিল বা আটকে দিয়েছিল সাহেবরা। এর ফলে অবশ্য সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হয়েছিল সাংঘাতিক। নদীর উপর দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খাবার পাঠানো বা মাছ ধরা কঠিন হয়ে গিয়েছিল তাদের পক্ষে।

দুর্গম প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-বৃষ্টি-বরফ অনেক সময়েই দেশে-বিদেশে নানা যুদ্ধের কেমন ধরন হবে তা ঠিক করে দিয়েছে। বাংলা-অসমের গল্প তো পড়লাম আমরা। অন্য দেশের ইতিহাসেও এরকম অনেক নজির পাওয়া যায়। রাশিয়ার কুখ্যাত শীতে কাবু হয়ে পিছু হটেছিলেন নেপোলিয়ান আর হিটলারের মতন যুদ্ধবাজেরা। তবে সেই ঠান্ডাকে তোয়াক্কা না করেই কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে। অনেকেই ভেবেছিলেন ডিসেম্বরের ঠান্ডায় এই যুদ্ধে ভাঁটা পড়বে, কিন্তু তা হয়নি। আসলে ঐ যে বললাম, যুদ্ধের ধরন, প্রযুক্তি, প্রস্তুতি সবই সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে। প্রকৃতি, পরিবেশ ও

যুদ্ধের সম্পর্কও তাই বদলে গেছে আজকের দিনে। আগে ঝড়, বৃষ্টি, বরফ, বন্যা যতটা বিপদে ফেলতে পারত সেনাবাহিনীকে, এখন আর তা পারে না। সেনাবাহিনীর কাছে আছে এমন সব অস্ত্র, গাড়ি, পোষাক-আসাক যে তারা সহজেই নানা প্রাকৃতিক বাঁধাকে টপকে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে।

৩) দেশে বিদেশে যুদ্ধ

যুদ্ধের ইতিহাস ঘাঁটতে বসলে দেখা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধের চরিত্র আস্তে আস্তে পাল্টে গিয়েছে। আঞ্চলিক যুদ্ধ সীমানা পেরিয়ে হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক। এক দেশের যুদ্ধের আঁচ পড়েছে আরেক দেশের ওপর। আজকের পৃথিবীতে এক দেশের অর্থনীতির সঙ্গে আরেক দেশের অর্থনীতি জড়িয়ে থাকে। কত রকম জিনিস দেওয়া নেওয়া চলে সকলের মধ্যে। ফলে এক জায়গায় যুদ্ধ লাগে, অন্য কোথাও আগুন দাম হয় জিনিসপত্রের। রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। পাকিস্তান গম আমদানি করত রাশিয়া আর ইউক্রেনের থেকে। যুদ্ধের জন্যে সেখানে আজ দারুণ গমের অভাব, খাবারের দাম খুব বেড়ে গেছে। ইউরোপের নানা দেশ তেল কিনত রাশিয়ার থেকে, তাদেরও জ্বালানির জোগান কমেছে, অন্য দেশ থেকে চড়া দামে কিনতে হচ্ছে। যুদ্ধ হচ্ছে রাশিয়া আর ইউক্রেনে, এদিকে পাকিস্তানে, জার্মানিতে সাধারণ মানুষের রোজের জীবনে খরচাপাতি বেড়েছে। যুদ্ধের জায়গা থেকে বহু দূরে থাকলেও রেহাই নেই, কোনও না কোনও ভাবে সবাই বিপাকে পড়ে।

পনেরো শতকে পর্তুগাল আর স্পেনের দেখানো পথ ধরে, আঠারো থেকে বিশ শতকের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের সব তাবড় তাবড় দেশ, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স আর হল্যান্ড – এশিয়া আর

আফ্রিকাতে উপনিবেশ দখলের দৌড়ে নেমে পড়েছিল। তাদের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে যুদ্ধ বাঁধলে অন্য প্রান্তে তার আঁচ পড়ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) কথাই ধরি। এই যুদ্ধে একদিকে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইতালিও অবশ্য দল পাল্টে যোগ দিয়েছিল তাদের সাথে। আর এদের উল্টোদিকে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি আর তুরস্কের মতো দেশ। একজনের সঙ্গে অন্য দলের কারও লড়াই বাঁধলে, সবাই তাতে জড়িয়ে পড়ত। আবার এদের সবার দখলেই ছিল নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা উপনিবেশ। ফলে লড়াই ছড়িয়ে যেত সেখানেও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল ভারতবর্ষ। তাই সে সময়ে ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছিল এদেশের প্রায় পনেরো লাখ মানুষকে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পূর্ব আফ্রিকা বা মেসোপোটামিয়ার (এখনকার ইরান-ইরাক) মতো জায়গায় প্রচুর ভারতীয় যুদ্ধে যায়। শুধু যুদ্ধ করাই নয়, প্রায় পাঁচ লাখ ভারতীয় মালপত্র বওয়া থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট তৈরির কাজেও গিয়েছিল। বাংলা থেকে বিভিন্ন জাহাজে কাজ করতে গিয়েছিল বহু লস্কর। কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে তাদের একটি স্মৃতিফলকও আছে। ঐ যে, যুদ্ধ মানেই দরকার বোড়েদের। সেনা-বাহিনী, কুলি-মজুর, মাঝি-লস্কর — এরা সবাই তো আসলে যুদ্ধের বোড়ে। ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে শুধুমাত্র বাঙালিদের নিয়ে ছয় হাজার লোকের ফৌজ গড়ে

তোলা হয়েছিল। তারা ১৯১৭ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত মেসোপটেমিয়াতে ছিল। কবি কাজী নজরুল ইসলামও এই রেজিমেন্টের অংশ ছিলেন। প্রায় এগারো হাজার ভারতীয় সেই সময়ে শুধু মেসোপটেমিয়াতেই মারা গিয়েছিল। ভাবলে অবাক হতে হয়! লড়াই লাগল সেই কত দূরের ইউরোপের দেশগুলোর দুই দলের মধ্যে। আর তাতে মরলেন বাঙালি-সহ কত কত ভারতীয়!

তাও তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাংলার ওপর সরাসরি লড়াইয়ের আঁচ পড়েনি। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধল। এবার কিন্তু যুদ্ধের আঘাত একেবারে সরাসরি নেমে এল বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ওপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও অনেক দেশ দুই পক্ষে ভাগ হয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল। একদিকে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। অন্য দিকে ছিল জার্মানি, ইতালি আর এশিয়ার দেশ জাপান। জাপানের নজর পড়ল এশিয়ার মধ্যে ব্রিটিশদের সব থেকে বড় উপনিবেশ ভারতের দিকে। পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে জাপানিরা মালয়, সিঙ্গাপুর জয় করে বর্মা অবধি এসে পৌঁছল। যুদ্ধ একেবারে বাংলা-অসমের দোরগোড়ায় এসে পড়ল। আক্রান্ত হল নাগাল্যান্ডের কোহিমা, মণিপুরের ইম্ফল। তারপর, ১৯৪৩ সালে, চব্বিশ পরগনা, ডানলপ-সাহাগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম-সহ বাংলার নানা জায়গায় প্লেন থেকে বোমা ফেলল ব্রিটেনের শত্রু দেশ জাপান। এমনকি খাস কলকাতাতেও বেশ কয়েকটা বোমা পড়েছিল।

সেই সময়ে তৈরি হওয়া একটা ছড়া কিন্তু এখনও আমরা বলে মজা পাই:

সা রে গা মা পা ধা নি
বোম ফেলেছে জাপানি
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ্!

বাংলার মানুষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সাংঘাতিক ভোগান্তি হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বরের রাতে কলকাতায় প্রথম বোমা পড়েছিল। সেদিন খুব বেশি কিছু ক্ষতি না হলেও মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। বোমার থেকে বাঁচতে চেয়ে ব্রিটিশরা এমন সব কাণ্ডকারখানা শুরু করল যে ভয় আরও ছড়াল মানুষের মধ্যে। সাদা মার্বেল পাথরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গায়ে গোবর লেপে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বোমারু বিমান থেকে চেনা না যায়। শুধু কি কলকাতা? মাদ্রাজেও এমন ভয় তৈরি হয়েছিল। জাপানিরা বোমা ফেললে সেখানকার চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারদের খাঁচা ভেঙে যাবে আর তারা বেরিয়ে পড়বে, এই ভয়ে একগাদা বেচারা প্রাণীকে ব্রিটিশ প্রশাসন মেরেই ফেলেছিল।

যে কোনও সময়ে বোমা পড়তে পারে এমন ভয়ে কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজের মানুষ শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিল দলে দলে। নানা সরকারি দলিলপত্র আর তখনকার খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে আন্দাজ করা যায় যে প্রায় দুই থেকে তিন লক্ষ মানুষ পায়ে হেঁটে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এতে সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় আর কি! তবে বোমার ভয়ে মানুষের পালাবার চেষ্টা নতুন কিছু ছিল না। জাপানিরা বর্মাতে বোমা ফেলা শুরু করার পর সেখান থেকেও প্রায় ছয় লাখের মতো মানুষ ভারতের দিকে পালিয়ে এসেছিলেন। অনেক কষ্ট করে, পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে, পায়ে হেঁটে আশ্রয় খুঁজতে এসেছিলেন তাঁরা। কেউ এসেছিলেন কলকাতার দিকে, আবার কেউ বা আসাম, ত্রিপুরাতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এঁদের মুখ থেকে শোনা গল্পেই আরও বেশি করে ভয় ছড়িয়েছিল ভারতের নানা শহরে। জাপানিদের আক্রমণের ভয়ে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর আর বর্মাতে সব কিছুই কেমন অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়ানোই একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধ ব্যাপারটাই এমন। যুদ্ধ শুধু ফ্রন্ট লাইনে গুলি ছুঁড়ে শেষ হয় না। তার আঘাত এসে পড়ে আমাদের রোজকার জীবনে।

লোকজনের কলকাতা ও অন্যান্য শহর ছেড়ে পালানো দেখে ব্রিটিশরা বেজায় বিরক্ত হল। তবে তাঁদের রক্ষা করার ব্যাপারে প্রথমদিকে তারা কিন্তু বিশেষ কিছু করেনি। তবে নিয়ম করে ব্ল্যাক আউট হত। রাত্তিরে সব ঘুটঘুটে অন্ধকার করে রাখা হত, যাতে ওপর থেকে এরোপ্লেনের পাইলটরা বুঝতেই না পারেন যে কোথায় বোমা ফেলতে হবে। আকাশপথে জাপানিদের টক্কর দেওয়ার জন্য হাতে সম্বল বলতে ছিল কয়েকটি মাত্র বিমান ধ্বংস করার কামান আর আটখানা যুদ্ধবিমান। এই দিয়ে জাপানি বোমারু প্লেনগুলোকে আটকানোর বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪৩-এর ৫ই ডিসেম্বর। ওইদিন একেবারে দিনের আলোতেই কলকাতায় বোমা ফেলেছিল জাপানিরা। তবে সত্যি বলতে বোমার ঘায়ের থেকে বোমার ভয় ছিল বেশি। আসল আঘাত এল অন্যভাবে। বোমার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো দেখা দিয়েছিল ভয়ানক দুর্ভিক্ষ।

ইতিহাসবিদরা হিসেব কষে দেখিয়েছেন যে ১৯৪৩ সালের (১২৫০ বঙ্গাব্দে হয়েছিল বলে পঞ্চাশের মন্বন্তরও বলা হয়) দুর্ভিক্ষে মারা যায় প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ। বাংলার যতটা চাল দরকার, তার বেশ খানিকটা আসত বর্মা থেকে। যুদ্ধের ফলে সেই রাস্তা আটকে গেছিল। তার ওপর যুদ্ধের সময় সৈনিক বা কারখানার কর্মীদের জন্য খাবার জোগাড় করতে গিয়ে ব্রিটিশ

সরকার বেশি করে শস্য দখল করে রাখতে শুরু করেছিল। এর ফলে বাজারে সাধারণ মানুষের জন্য খাবারের জোগানে টান পড়ল। বাজারে যখন কোনও জিনিসের জোগান কমে যায় তখন তার দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল জাপানিরা বাংলায় ঢুকে পড়বেই এমন আশঙ্কায় ব্রিটিশদের চালু করা "Scorched Earth" বা পোড়া মাটি নীতির ধাক্কা। শত্রুরা যাতে খাবার দাবার না পায়, তাই তাদের আসার পথে সব কিছু নষ্ট করে ফেলা হবে – এই ছিল নীতির মূল কথা। নেপোলিয়ন বা হিটলারের আক্রমণের সময় রাশিয়াতেও এমনটাই করা হয়েছিল। কিন্তু এই নীতির ফলে অভাব অনটন বাড়ল বাংলার মানুষের। একেই বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা। শত্রুর খাবারের জোগান বন্ধ করতে গিয়ে দেশের মানুষেরই খাবারে টান পড়ল। আর আগেই তো বলেছি নদীপথে জাপানিরা যাতে ঢুকতে না পারে, তাই বাংলার নৌকোগুলোও নষ্ট করে ফেলেছিল বৃটিশরা। সব মিলিয়ে দারুণ অভাবে মারা পড়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। যুদ্ধের প্রধান মঞ্চ ছিল ইউরোপ। কিন্তু সেই যুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষ হল সুদূর বাংলায়, বেঘোরে প্রাণ গেল কত!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ যেন আর শেষ হয় না! ঠিক তার পরপরই শুরু হয় আরেক যুদ্ধ। ১৯৪৫-১৯৯০ পর্যন্ত চলেছিল এই যুদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর

সোভিয়েত ইউনিয়ন (যার মাথা ছিল রাশিয়া)-এর মধ্যে হওয়া এই যুদ্ধের নাম ঠান্ডা লড়াই। ঠান্ডা লড়াইয়ের কথা এই সুযোগে তোমাদের একটু বলি। এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু নিজেদের মধ্যে সরাসরি লড়াই করেনি। অথচ নানা ভাবে সবসময় একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেত। ঠিক যেন তলে তলে যুদ্ধ চলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই দুটো দেশ সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই এদের সুপার পাওয়ার বলা হত। এই দুই দেশ এক্কেবারে আলাদা দু-রকম আদর্শ আর রাজনীতিতে বিশ্বাস করত। মার্কিনরা ছিল ধনতন্ত্রের (capitalism) সমর্থক। উল্টোদিকে সোভিয়েতরা বিশ্বাস করত সাম্যবাদে (socialism)। দু-জনেরই লক্ষ্য ছিল যেভাবেই হোক বিশ্বের অন্য দেশগুলিকে নিজের দলে টানা। যার দলে যত বেশি দেশ আসবে, সে তত শক্তিশালী। ফলে বিভিন্ন দেশকে কখনও টাকা ধার দিয়ে, আবার কখনও অস্ত্র সরবরাহ করে এরা নিজেদের দল ভারী করার চেষ্টা করত। আবার কখনও অন্য কোথাও, অন্য দুই দেশের মধ্যে লড়াই লাগলে, সেখানে নাক গলিয়ে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টাও করত। মানে ধরো, রাম আর শ্যামের যুদ্ধ বেঁধেছে। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি রামকে সাহায্য করে দলে টানতে চায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে শ্যামকে সাহায্য করতে।

রাম-শ্যামের মতোই ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ লেগেছিল। আর এই যুদ্ধ হয়েছিল পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরার গা ঘেঁষে, আজকের বাংলাদেশে। যখন এই যুদ্ধ শুরু হয়, তখন অবশ্য বাংলাদেশ বলে কিছু ছিল না। এই জায়গাটা ছিল পাকিস্তানের একটা অংশ, নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এই সময়ে পাকিস্তানের থেকে আলাদা হতে চেয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের এই দাবিকে সমর্থন করেছিল ভারত। এই নিয়েই বেঁধেছিল লড়াই। ইতিহাসে এই লড়াইয়ের নাম মুক্তিযুদ্ধ। তা দুই সুপার পাওয়ার যখন সবেতেই নাক গলাচ্ছে, তারা যে ১৯৭১ এর যুদ্ধেও নাক গলাবে, এতে আর আশ্চর্য কি। তার ওপর সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পাকিস্তানের বন্ধু। আবার চিনের সঙ্গেও তখন মার্কিনদের সম্পর্ক বেশ ভাল ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চিন যদি পাকিস্তানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত, তাহলে ভারত কিন্তু মোটেও তাদের ঠেকাতে পারত না। হয়তো সেরকম হলে যুদ্ধে নামতই না ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো এক ঝাঁক যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে পাঠাবে বলে ঠিকই করে ফেলেছিল। ভারতও বেগতিক বুঝে সোভিয়েতদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলেছিল। সোভিয়েতরাও এবার পাল্টা হুমকি দিয়ে বসল, যে আমেরিকা জাহাজ পাঠালে তাঁরাও কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না। শেষ পর্যন্ত দুই সুপার পাওয়ার আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাড়াবে না বলেই বোধহয় সেরকম কিছু করেনি। কিন্তু এ যুগে কোনও স্থানীয় যুদ্ধই যে শুধু স্থানীয় না, মুক্তিযুদ্ধের সময়েও সে কথা টের পাওয়া গিয়েছিল।

৪) মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু একটু অন্যরকম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৪৭ সালে। সে-বছর দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু ব্রিটিশ ভারত ভাগও হল। এখন যে দেশটাকে আমরা পাকিস্তান বলে জানি, তাকে তখন পশ্চিম পাকিস্তান বলা হত। আবার বাংলা ভাগ করে তৈরি হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। দেশভাগ তো হল। কিন্তু পশ্চিম আর পূর্ব পাকিস্তানের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর সময়ের নানা রকম দলিল, খবরের কাগজ, ডায়েরি আর মানুষজনের স্মৃতিকথা পড়লে এই সম্পর্কের কথা আন্দাজ করা যায়। নতুন দেশটি পূর্ব-পশ্চিম দুই অংশ নিয়ে তৈরি হলেও পশ্চিমের হাবভাব ছিল শাসকের মতো। কিন্তু পশ্চিম ছিল এমনই শাসক যে কিনা বিপদে-আপদে পূর্বের পাশে থাকে না, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের তেমনই মনে হত। যেমন ১৯৬৫ সালে যখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে একটা যুদ্ধ চলছে, তখন পূর্বের মানুষ দেখলেন যে সৈন্যসামন্ত সব রয়েছে পশ্চিমে। পূর্ব পাকিস্তানের কী হল তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথাই নেই। ১৯৭০-এ তাঁরা আবার দেখলেন যে ভয়ানক ভোলা সাইক্লোনে পূর্ব পাকিস্তানের বহু মানুষের

ক্ষতি হলেও, পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের তাতে কিছু যায় আসে না। পাকিস্তানের বাজেট এমন ভাবে ঠিক করা হত যে তাতে যেন শুধু পশ্চিমেরই উপকার হয়। পূর্ব পাকিস্তানে যে পাট উৎপাদন হত, তার সুফলও পেত পশ্চিম। এ যেন সেই রূপকথার সুয়োরানি দুয়োরানির গল্প! একজনের ভাগে রাজপ্রাসাদ, আরেকজনের জন্য কুড়েঘর! সবমিলিয়ে একই দেশের দুই টুকরোর মধ্যে মনোমালিন্যের শেষ নেই। তার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতামন্ত্রীরা তো বটেই, এমনকি সাধারণ মানুষের একাংশও পূর্ব পাকিস্তানের বাংলায় কথা বলা মানুষদের যেন একটু খাটো চোখে দেখতেন। রুটি ফেলে, মাছ-ভাত খাওয়াও তাদের চোখে ছিল পূর্বের লোকেদের দুর্বলতার প্রমাণ! পশ্চিমের লোকেদের এই ব্যবহারে আর যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মোটেও খুশি হওয়ার কথা না।

সবচেয়ে বড় গোলমাল বেঁধেছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে না রেখে উর্দু চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তানের সংবিধান তৈরির সভায়, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, যেহেতু পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় চার কোটি মানুষ, তাই বাংলারই রাষ্ট্র ভাষা হওয়া উচিত। এটা পাকিস্তানের প্রথম

গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান একেবারেই মানতে পারেননি। উর্দু দিয়েই পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে এক করবেন, এই ছিল তাঁদের ভাবনা। একথা শুনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা, তা সে মুসলিম হন বা হিন্দু, ভয়ানক রেগে গেলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে ঢাকায় বিশাল মিছিল বেরোলে তার ওপর পুলিশ চালালো গুলি, মারা গেল পাঁচ ছাত্র। মানুষের একরোখা প্রতিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালে বাংলা আর উর্দু দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষজন বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাষার অধিকার পেলেও তাঁরা কখনও পাকিস্তানের পশ্চিমের লোকেদের সঙ্গে সমান সমান সুযোগ-সুবিধে বা অধিকার পাবে না ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামি লীগ গোটা পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসনে জিতেছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি, ইয়াহইয়া খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের নেতার প্রধানমন্ত্রী হওয়া আটকাতে একেবারে পার্লামেন্টে তালা লাগিয়ে দিলেন। এই ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের বহু মানুষ খুবই বিরক্ত হলেন। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ মুজিবুর রহমান হাঁক দিলেন — "এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম"। এই ডাক

ছিল পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে নিজেদের আলাদা দেশ বাংলাদেশ গড়ার ডাক। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আর উপায় না দেখে সৈন্যবাহিনী নামিয়ে দিলেন। ২৫শে মার্চের রাত্তিরে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা অপারেশন সার্চলাইট নাম দিয়ে ঢাকা-সহ আরও নানা জায়গায় আক্রমণ শুরু করে। মুজিবুর রহমান সেই রাতে গ্রেপ্তার হলেন। তবে এরপরেই আর একজন বাংলাদেশপন্থী সেনানায়ক, জেনারেল জিয়াউর রহমান রেডিওতে জানিয়ে দিলেন যে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে অবশ্য আরও কিছুদিন সময় লেগেছিল। ১০ই এপ্রিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের সৈন্য, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্য, আনসার বলে এক ধরনের আধা সৈন্য বাহিনীর পাশাপাশি, বিভিন্ন বয়সের হাজার হাজার সাধারণ পুরুষ ও মহিলারা মিলে মুক্তিবাহিনী গড়ে তুললেন। শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধে প্রচুর সাধারণ মানুষ মারা পড়ছিল। তার উপরে লক্ষ লক্ষ মানুষ পালিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল ভারতে। প্রায় এক কোটি মানুষের দায়িত্ব নেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই জন্যে প্রথম থেকেই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে আসা ভারতও এবার ভাবতে শুরু

করল যে কীভাবে তাড়াতাড়ি এই যুদ্ধ শেষ করে সব ঘরছাড়া মানুষকে আবার ফেরত পাঠানো যায়। ভারতের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়ার মতো দেশগুলো ঘুরে ঘুরে মানুষের দুর্দশার কথা জানিয়ে, যুদ্ধ থামিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করার তদবির করতে শুরু করলেন। বাংলাদেশের নেতারাও চাইছিলেন যে ভারত এবার সরাসরি যোগ দিয়ে তাড়াতাড়ি যুদ্ধটা শেষ করতে সাহায্য করুক।

আচ্ছা, ভারত কেন প্রথম থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিল? তার পিছনে একদিকে ছিল রাজনৈতিক তাগিদ, আর অন্য দিকে ছিল মানবিকতার প্রশ্ন। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সেই ১৯৪৭ থেকেই খারাপ, তাই পূর্ব আর পশ্চিম দুই সীমান্তেই শত্রু দেশ থাকলে, সেটা বেশ গণ্ডগোলের ব্যাপার। ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ধরে নেওয়া যায় যে সে বন্ধু হবে। তাহলে আর পূর্ব সীমান্ত নিয়ে ভারতের ভয় থাকবে না খুব একটা। আর মানবিক কারণ তো ছিলই। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারত দাঁড়াতে চেয়েছিল। তাছাড়া এক কোটির মত উদ্বাস্তু মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার চাপ সামলানো আর ভারতের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তবে সরাসরি যুদ্ধে নামার অনেক আগে থেকেই ভারত বাংলাদেশপন্থীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল। যেমন ওদেশ থেকে পালিয়ে আসা

বাংলাদেশপন্থী নেতাদের আশ্রয় দেওয়া, অল্পদিনের জন্য তৈরি হওয়া বাংলাদেশ সরকারকে কলকাতায় জায়গা করে দেওয়া। আবার একটা রেডিও স্টেশনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার নামের এই রেডিও স্টেশনের গান, খবর, নাটক তখন দুই বাংলার মানুষকেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উৎসাহিত করেছিল।

পাকিস্তানের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ছিল গৃহযুদ্ধ বা civil war। তারা নিজের দেশ দু-টুকরো হওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। একই দেশের মধ্যের দুই পক্ষের ক্ষমতা দখলের লড়াই আর কী! সেখানে বাইরে থেকে ভারত এসে নাক গলানো শুরু করল। তা সে মানবে কেন? সেই রাগে তারা ১৯৭১ এর ৩রা ডিসেম্বর রাজস্থান, জম্মু আর পঞ্জাবে বিমান আক্রমণ করে বসল। তখন ভারত একেবারে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ শুরু করার পাশাপাশি, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ১৯৭১ এর ৬ই ডিসেম্বর, ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানেও ঢুকে পড়ে। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষমেশ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়ে গেল। এই যুদ্ধে শেষ অবধি পাকিস্তান হেরে যায়। ১৫ই ডিসেম্বর ভারতের প্যারাশুট বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রায় বিনা বাধায় ঢাকায় ঢুকে পড়ে। যুদ্ধ শেষ হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় শান্তি চুক্তি সই হয়। জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

৫) যুদ্ধের রিপোর্ট কার্ড

এই অবধি মুক্তিযুদ্ধের যে কথা বলেছি, তাতে তোমাদের মনে হতে পারে যে, এ তো ভালোর সঙ্গে খারাপের যুদ্ধের একটা জমজমাট সিনেমার গপ্প। তবে, আসল যুদ্ধ কখনওই এতটা সাদা-কালো হয় না। মুক্তিযোদ্ধারা যে দেশ তৈরির কথা বলছিলেন, তার সঙ্গে তো পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কিছু মানুষ একমত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে বাঙালি, অবাঙালি দুই দলের লোকই ছিলেন। অবাঙালিদের মধ্যে বেশিরভাগই দেশভাগের সময় বিহার থেকে এসেছিলেন। এঁদের ভাষা, আদবকায়দা বাঙালিদের থেকে আলাদা হওয়ায় তাঁদের বাংলাদেশের বিরোধী বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন অনেকে। তবে এটাও ঠিক যে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানেই থাকতে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার পাকিস্তানপন্থী দুটো বাহিনী, আল-বদর আর আল-শামসের হয়ে মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী এমনকি সাধারণ মানুষদের মেরে ফেলার মত কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে যেমন বিহারীরা যুক্ত ছিলেন, তেমনি অনেক বাঙালিরও হাত ছিল। অথচ কথায় আছে না, যত দোষ, নন্দ ঘোষ। বিহারীদের অবস্থা হল তেমনি। তাঁদের সবাইকেই শত্রু মনে করলেন বাকিরা। যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই, বিহারীদের

ওপরে নেমে এসেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নানা আঘাত। হাজার হাজার বিহারী মানুষ মারা পড়েছিলেন যুদ্ধের সময়টা জুড়ে। যুদ্ধের পরেও বিহারীদের ওপর রাগ গেল না বাংলাদেশের। নতুন দেশ বাংলাদেশ তাদের নাগরিক হিসাবে মেনে নিল না। আবার পাকিস্তানও তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে গেল না। প্রায় কোনও অধিকার ছাড়াই তিন লাখ বিহারি এখনও বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা আশ্রয় শিবিরে রয়েছেন। যে যুদ্ধকে ওপর ওপর দেখে ভালো বা দরকারি বলে মনে হয়, তার শেষেও তাহলে থেকে যায় রাগ, হিংসা। এর থেকেই আবার কখনও কখনও তৈরি হয় আরেকটা যুদ্ধ।

এরপরে আছে যুদ্ধের খরচ। সব যুদ্ধেই বিপুল খরচ হয়। আর সেই টাকার সিংহভাগই যায় নানা ধ্বংসাত্মক কাজে। আজকের দিনের হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খরচ হয়েছিল প্রায় চার ট্রিলিয়ন ডলার, মানে প্রায় ৩২৭৩১৩৪০০০০০০০০ টাকা! অথচ এই টাকায় কত ভালো কাজ করা যেত — স্কুল, হাসপাতাল, কল-কারখানা, চাষবাস। আর এই খরচের প্রভাব শুধু তখনকার মানুষের ওপরেই পড়ে না। এই খরচের ধাক্কা সামলাতে চলে যায় আরও অনেকগুলো বছর। আর শুধু খরচ তো না, বেঘোরে প্রাণ যায় কত মানুষের। আগেই বলেছি,

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধের জন্য ধ্বংস আর মৃত্যু আগের যুগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিমান থেকে বোমা ফেলে শহরের পর শহর মাটিতে মিশিয়ে দেওয়াই ছিল সেই সময়ের যুদ্ধের নতুন কৌশল। অস্ত্রের বহর আজ আরও ভয়ানক হয়েছে। মানুষ সাংঘাতিক সব মিসাইল বানিয়ে ফেলেছে। তাই দিয়ে স্রেফ একটা ছোট্ট সুইচ টিপে হাজার হাজার মাইল দূরের কোনও শহরকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। সভ্যতা গড়তে কত সময় লাগে, কিন্তু তা মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে একটা যুদ্ধ।

তা সত্ত্বেও কিন্তু সৈন্য, অস্ত্র, বারুদ ছাড়া পৃথিবীর কথা আমরা আর ভাবতেই পারি না। হয় নিজেকে বাঁচাবার জন্য, না হয় কিছু ছিনিয়ে নিতে, যুদ্ধ কিন্তু হয়েই চলেছে। যুদ্ধের যুক্তি-তক্কো, ভালো-খারাপের বাইরেও আরেক রকমের লাভ ক্ষতির হিসেব থাকে। অস্ত্রের ব্যবসার কথাই যদি ভাবি আমরা, যত যুদ্ধ হবে তাতে আর যারই ক্ষতি হোক, অস্ত্র ব্যবসায়ীদের শুধুই লাভ। অন্যদিকে সুপার পাওয়ারদের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ যেন একরকম জরুরি হয়ে পড়ে। মাঝেমধ্যে যুদ্ধ লাগলে তাদের মতই কোনও কোনও দেশের রাজনৈতিক লাভ হয়, বিশ্বে তাদের ক্ষমতা বাড়ে। তবে এসবের মধ্যেই আরও এক ধরনের যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ

হল, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে একটা চেতনা তৈরি হতে শুরু করেছে। এত ধ্বংস, এত মৃত্যু, সাধারণ মানুষের এত দুর্দশা এর আগে দেখেনি কেউ। এক-একটা যুদ্ধের এলাকা বাড়তে বাড়তে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছিল। অস্ত্রের ধ্বংস করবার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুন। এই সবের ফলে খরচ বা ক্ষয়ক্ষতির হিসেব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে যুদ্ধ থামানোর কথা বলতে শুরু করেন অনেকেই। যাতে আর কখনও এমন বড় যুদ্ধ না বাঁধে তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তৈরি হয়েছিল লীগ অফ নেশন্স (League of Nations) বা জাতিসংঘ। লীগের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঝগড়া বাঁধলে, তা যুদ্ধ অবধি গড়াবার আগেই মিটমাট করে ফেলা। লীগ বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়িয়ে যায় আগের সব হিসেব। যুদ্ধ আটকানোর জন্য এবার তৈরি হয় United Nations বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। যুদ্ধ যে এখনও বন্ধ করা যায়নি সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু মানুষ হাল ছাড়েনি। শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক-গায়িকা বা সাধারণ মানুষ নিজেদের মতো করে যুদ্ধের বিরোধিতা করে চলেছেন।

এই সূত্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা বলা যাক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ছোট্ট দেশটা, প্রথমে

যুদ্ধ করে ফ্রান্সের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও ঠান্ডা লড়াইয়ের প্যাঁচে পড়ে দু'-ভাগ হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের স্বাধীন আর ঐক্যবদ্ধ করতে আবার ১৯৬১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারের পাশাপাশি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই চালাতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম দখল করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন অনেকে। এমনকি মার্কিন দেশের মানুষও তাঁদের নিজেদের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। গানে কবিতায় শান্তির খোঁজ করেছিলেন বব ডিলান, পিট সিগার বা জন লেননের মতো বিরাট মাপের শিল্পীরা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। যুদ্ধ-বিরোধী গান, কবিতা, গল্প, সিনেমা ক্রমশ মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। ভিয়েতনাম কোনও ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের দুর্দশার কথা সকলকে জানাতে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে Concert for Bangladesh-এ জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে গান গেয়েছিলেন বহু শিল্পী। তবে শুধু আমেরিকা ইউরোপেই কিন্তু যুদ্ধের বিরোধিতা আটকে থাকেনি। ভারতবর্ষেও শিল্পের মাধ্যমে শান্তির খোঁজ করেছেন অনেকেই। বিখ্যাত লেখক, চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর 'গুপি গাইন

বাঘা বাইন' সিনেমার শেষে দেখা যায়, গুপি-বাঘা কেমন হাল্লা রাজার সৈন্যদের আটকে প্রশ্ন করছেন যে যুদ্ধ করে তাঁদের লাভটা কী? গুপি-বাঘার ভাষায়:

মিথ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ধরে প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে?

রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল, তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল?

যুদ্ধের ইতিহাস কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নটার সামনেই দাঁড় করায় আমাদের। যুদ্ধ করে লাভ কী? সেই লাভ কার আর কার ক্ষতি? মোবাইলে বা ভিডিও গেমে যখন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলবে তখন কিন্তু মনে রেখো যুদ্ধে তোমার আমার মতো মানুষের ক্ষতিই হয়েছে বেশি, লাভ হয়নি বিশেষ, ইতিহাস সাক্ষী।

সরাইঘাট ১৬৭১
চট্টগ্রাম ১৬৬৬
মায়ানমার/বর্মা
আরাকান
প্রথম ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ
১৮২৪-১৮২৬
মুঘলদের পূর্ব ভারত অভিযান
ইংরেজদের বর্মা অভিযান
ম্যাপ স্কেল অনুসারে নয়

মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১
পশ্চিম পাকিস্তান
ভারত
পূর্ব পাকিস্তান (১৯৭১-অবধি)
বাংলাদেশ (১৯৭১-পর)
ম্যাপ স্কেল অনুসারে নয়

খটমট শব্দ

সুবাদার	মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিকে সুবা বা সুবাহ বলে ডাকা হত। এর প্রধান প্রশাসককে সুবাদার বলে ডাকা হত।
গেরিলা	একটু অন্য ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি। গেরিলা যুদ্ধ অনেক সময়েই দুর্গম বন-জঙ্গল এলাকায় হয়ে থাকে। গেরিলা যোদ্ধারা পরিবেশ বা ভৌগোলিক সুবিধে ব্যবহার করে লড়াই করে। ক্ষমতায় এগিয়ে রয়েছে এমন প্রতিপক্ষের উপর তারা লুকিয়ে আঘাত হেনেই কখনও জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে, আবার কখনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যায়।
খাজনা	সরকারকে বা রাজাকে বা জমিদারকে তাদের জমিতে চাষবাস করবার জন্যে প্রজারা যে কর বা ট্যাক্স দিয়ে থাকে।
লস্কর	ইউরোপীয় জাহাজে ভারতীয় নাবিক বা খালাসীদের এই নামে ডাকা হতো। এরা জাহাজ চালানো থেকে শুরু করে জিনিসপত্র নামানো ওঠানোর মতো নানা কাজ করত।

গৃহযুদ্ধ	গৃহযুদ্ধ এক ধরনের যুদ্ধ যা নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র বা দেশের ভেতরেই দুটি বা বেশি দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে হয়। সাধারণভাবে গৃহযুদ্ধের ফলে একটি দেশের থেকে দু'টি স্বাধীন দেশ তৈরি হয়, বা কোন একটি গোষ্ঠী ক্ষমতা লাভ করে।
সাম্যবাদ	সাম্যবাদ হল এমন একটা সমাজের ধারণা বা আদর্শ, যেখানে কোন উঁচু-নিচু, গরিব বা বড়লোক শ্রেণি থাকবে না। এই সমাজ হবে শোষণহীন এবং যেখানে দেশের বা সমাজের সম্পদের ওপর কারো একার ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। সমস্ত সম্পদের ওপর অধিকার থাকবে মানুষের। এই আদর্শ অনুযায়ী জমি, খনি, কলকারখানা সবই থাকে রাষ্ট্রের হাতে।
বাজেট	সরকারের আয় ব্যয়ের হিসেবপত্র। বাজেটে বলা থাকে সরকার কোথায় কিভাবে টাকা খরচ করবে।
ধনতন্ত্র	ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ হল একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে চাষ-আবাদ, খনি, কল কারখানা সবই ব্যক্তিগত মালিকদের কথা অনুযায়ী চলে। এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল উৎপাদন থেকে যতটা বেশি সম্ভব লাভ করা।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশকে নিয়ে তৈরি হওয়া একটি সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্দ্যেশ্য হল কোনও দুই দেশের মধ্যে ঝামেলা বাঁধলে আলাপ আলোচনা করেই মিটমাট করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা, যাতে আরেকটা যুদ্ধ না বাঁধে। আবার যুদ্ধ বাঁধলেও তা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

উপনিবেশ একটি শক্তিশালী দেশ যখন অন্য কোনও দেশ বা এলাকা দখল করে সেখানে নিজেদের শাসন চালু করে। ভারতবর্ষ যেমন দীর্ঘদিন ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল।

যুদ্ধ নয়
শান্তি চাই
শান্তি
মৃত্যু নয়
জীবন চাই
শত্রু নয়

ল
যুদ্ধ নয়
শান্তি চাই
মৃত্যু নয়
জীবন চাই
ক্ষু চাই
শত্রু নয়
বন্ধু চাই

শেষের কথা

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ আমি কোত্থেকে একগাদা যুদ্ধের গল্প বানিয়ে বানিয়ে লিখলাম? গন্ডাখানেক বই পত্তর, প্রবন্ধ আর ওয়েবসাইট ঘেঁটে এইটা লিখতে পেরেছি! আসলে কি বলো তো, ইতিহাস কিন্তু মন গড়া কথা দিয়ে লেখা যায় না। তার জন্য নানা রকম বই পত্তর, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখতেই হয়। সেখানেই কিন্তু ইতিহাসের আসল মজা। তাহলে এই ফাঁকে আমি যা যা পড়েছি তার কয়েকটির কথা তোমাদের বলে রাখি।

মুঘলদের বাংলা আর আসাম অভিযান, যুদ্ধের সঙ্গে প্রকৃতি-পরিবেশের যোগাযোগের কথা পড়েছি তিনটি বইয়ে। প্রত্যয় নাথের লেখা 'Climate of Conquest: War, Environment, and Empire in Mughal North India', ব্যোমকেশ ত্রিপাঠি আর সৃষ্টিধর দত্তের 'Martial Traditions of North East India' এবং কৌশিক রায়ের 'Small Wars, Ecology, and Imperialism in Precolonial South Asia: A case study of Mughal-Ahom Conflict, 1615-1682'।

বর্গী হানার কথা জানতে পেরেছি যোগেন্দ্র নাথ সমাদ্দারের 'The Bargi Invasion of Bengal' বলে একটি প্রবন্ধে এবং স্টুয়ার্ট গর্ডনের লেখা 'Marathas, Marauders & State Formation in Eighteenth Century India' বইয়ে।

ইংরেজদের সাথে বর্মার রাজাদের যুদ্ধের কথা পড়েছি জি. পি. রামচন্দ্রের 'The Outbreak of the First Anglo Burmese War' এবং অলিভার পোলকের 'The Origins of the Second Anglo-Burmese War' থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ এবং বাংলার যোগের কথা পেয়েছি রাধিকা সিংহার লেখা 'The Coolie's Great War: Indian Labour in a Global Conflict, 1914-1921' বইয়ে আর আনসার আহমেদ উল্লাহের 'Remembering the Bengali Contribution during the First World War' বলে একটি চমৎকার ব্লগ পোস্টের (blogs.lse.ac.uk/southasia) থেকে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর ভারতে জাপানি বোমা পড়বার কথা রয়েছে ডেভিড লকউডের 'Calcutta Under Fire: The Second World War Years' এবং ইন্দিবর কামতেকারের 'The Shiver of 1942' - এই দুটো লেখায়। জনম মুখার্জীর লেখা 'Hungry Bengal: War, Famine and the End of Empire' বলে বইটি থেকে জেনেছি ১৯৪৩ সালের ভয়ানক দুর্ভিক্ষের কথা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছি মঈদুল হাসানের লেখা 'মূলধারা ৭১', আনাম জাকারিয়ার লেখা '1971: A People's History from Bangladesh, Pakistan and India' এবং শ্রীনাথ রাঘভনের লেখা '1971: A Global History of the Creation of Bangladesh' - এই বইগুলো থেকে।

বইয়ে হয়ত কিছু কিছু জায়গার বা মানুষের নাম তোমাদের অচেনা ঠেকেছে। সেরকম কয়েকটা নাম একটু চিনিয়ে দিই তোমাদের।

১। ভিয়েতনাম: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশ। এক সময়ে ফ্রান্স আর তারপর জাপানের উপনিবেশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হো চি মিনের নেতৃত্বে এরা দেশ স্বাধীন করলেও ঠান্ডা লড়াইয়ের সময় আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দেশকে দু-ভাগ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছর যুদ্ধ করার পর ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হয়।

২। হিরোশিমা আর নাগাসাকি: জাপানের দুটি শহর। ১৯৪৫ এর ৬ই ডিসেম্বর হিরোশিমা আর ৯ই ডিসেম্বর নাগাসাকির ওপর পরমাণু বোমা ফেলেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩। বব ডিলান: মার্কিন গায়ক ও কবি। সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে বহু গান গেয়েছেন। ২০১৬ সালে সাহিত্যের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। যদি সুযোগ পাও, তাহলে এই গানটা একবার শুনতে পারো - https://youtu.be/MMFj8uDubsE

৪। পিট সিগার: মার্কিন গণসংগীত শিল্পী ও সমাজকর্মী। সারা পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ, কষ্ট আর অধিকারের দাবির কথা তিনি বলে গেছেন তাঁর গানের সুরে। ২০১৪ সালে এই মহান শিল্পী মারা যান। তাঁর এই গানটা একবার শুনে দেখতে পারো - https://youtu.be/PS3-lyqCl80

৫। জন লেনন: ইংল্যান্ডের প্রবাদপ্রতিম রক-সংগীত শিল্পী। তাঁর ব্যান্ড 'বিটলস' এর গান এখনও বেশ জনপ্রিয়। পরের দিকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানেই গানের সুরে শান্তির কথা বলেন। ১৯৮০ সালে গুলির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর একখানি অসাধারণ গানের লিংক দিলাম তোমাদের জন্য - https://youtu.be/YkgkThdzX-8

৬। জর্জ হ্যারিসন: 'বিটলস' ব্যান্ডে ইনি ছিলেন জন লেননের সঙ্গী। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রক গিটার বাদক ও গাইয়েদের একজন। ২০০১ সালে মারা যান। মহান সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে করা ওঁর Concert for Bangladesh এর একটা ভিডিওর লিংক দিলাম এইখানে - https://youtu.be/Tby39qh9Lts

লেখক ও শিল্পী পরিচয়

এই বইটি লিখেছেন শান্তনু সেনগুপ্ত। শান্তনু পোলবা মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ান।

বইটির চিত্র-পরিকল্পনা, প্রচ্ছদ ও মানচিত্র তৈরি করেছেন ওয়াসিম হেলাল। ওয়াসিম পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার। নানা দেশী বিদেশী প্রকাশনা সংস্থার সাথে ওয়াসিম বইয়ের ছবি, প্রচ্ছদ ও চিত্র-পরিকল্পনার কাজ করেন।

বইটির ছবি এঁকেছেন রঞ্জিত চিত্রকর ও সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর। তাঁরা বংশ পরম্পরায় পটশিল্পী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার নয়াগ্রাম থেকে কাজ করেন রঞ্জিত ও সিরাজ। পটশিল্পের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁরাও মূলত হিন্দু দেব-দেবীর আখ্যান আঁকেন ও সেই নিয়ে গান বাঁধেন। তবে এখন তাঁরা নানা অন্য বিষয় নিয়েও পট তৈরি করছেন। পটচিত্র বাংলার ধর্মীয় সমন্বয়ের ঐতিহ্যের প্রমাণ। পটশিল্পীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁরা মূলত হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করে তাঁদের ছবি আঁকেন ও গান বাঁধেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের নিজস্ব সামাজিক আখ্যান অনুসারে তাঁরা হিন্দুদেবতা বিশ্বকর্মার বংশধর। এভাবে তাঁদের জীবনে ও কাজে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম মিলেমিশে রয়েছে।

কর্মশালায় ও ব্যক্তিগত পরিসরে এই বইটির প্রাথমিক খসড়া পড়ে/শুনে নানা মতামত ও উৎসাহ দিয়েছেন অনেকে। তাঁদের নামগুলো একে একে বলি: অচিন চক্রবর্তী, অনির্বাণ মণ্ডল, অন্বেষা সেনগুপ্ত, আবিরা বসু চক্রবর্তী, আরভি পাল, ঐশী দত্ত, কৌশিক রায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, কৌস্তুভ মণি সেনগুপ্ত, দেবতনু রাহা, দেবারতি বাগচী, প্রত্যয় নাথ, প্রিয়ঙ্কর দে, বর্ষনা বসু, রজত রায়, রোশনি দে, লক্ষী সুব্রহ্মণ্যন, শিঞ্জিনী সরকার সেনগুপ্ত, শ্রীপর্ণা মিত্র সিনহা, সঞ্জয় কুমার ঘোষ, সাজ্জাদ আলাম রিজভি, সুপূর্ণা ব্যানার্জী, সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, হিয়া সেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

The Institute of Development Studies Kolkata (IDSK) was set up in 2002 by the Government of West Bengal as an autonomous centre of excellence in social sciences. It is a society with an autonomous governing body with eminent scholars and Government's nominees. IDSK is recognized for its advanced academic research and informed policy advice in the areas of literacy, education, health, gender, employment, technology, communication, human sciences and economic development. The academic programmes at IDSK include MPhil (2006-2022) and PhD in social sciences and short training courses for research scholars. It offers state-of-the-art IT and library facilities to its students and research scholars. It is fully funded by the Government of West Bengal. IDSK has been recognized by the ICSSR under the category of "ICSSR Recognized Research Institutes".

The Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a German political foundation that is part of the democratic socialist movement. True to the legacy of its namesake Rosa Luxemburg (1871-1919), it stands in solidarity with the workers' and women's rights movements. the organization serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as research centre for social development. The RLS has close ties to the German party DIE LINKE. RLS provides political education and a centre for advanced social research in both Germany and throughout the world. RLS is one of six party-affiliated political foundations in Germany; it supports partners in over 80 countries striving for social justice, strengthening public participation, and social ecological development.

চোখ-কান খোলা রেখে ইতিহাস শেখা যায় কেমন করে? ইতিহাস-সচেতন হওয়া কাকে বলে? এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে 'ইতিহাসে হাতেখড়ি' সিরিজের কথা ভাবা। একেকটি বই একেকটি বিষয় নিয়ে। লেখার সঙ্গে থাকছে পটচিত্র শিল্পীদের আঁকা ছবি। ইতিহাসের নানা সময়, নানা জটিল ধারণা সহজভাবে বুঝিয়ে বলাই এই বইগুলোর উদ্দেশ্য। বইগুলো পড়ে ছোটরা প্রশ্ন করতে শিখবে - এমনটাই আমাদের আশা।

IDSK
ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA